মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত একথা উনিশ শতকের মনীষীরা অনেকেই ভেবেছেন, এমনকি সামাজিক বিধিবিধানে রক্ষণশীল, রাজা রাধাকান্ত দেব যিনি সতীদাহ প্রথার সমর্থক, তিনিও মেয়েদের লেখাপড়ার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তবে স্কুলে যাওয়া, পুরুষের কাছে পড়া এসবই ছিল তখন কল্পনার বাইরে। রাজা রাধাকান্তদেব কলকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন এবং ১৮১৯ এ যখন কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল তিনি তাতে অনেক সাহায্য করেন। বিলেত থেকে মিস মেরী অ্যান কুককে আনানো হল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কিন্তু চেষ্টা করেও এরা মেয়েদের স্কুল করতে পারলেন না।[১৫] তখন বেসরকারি উদ্যোগে কলকাতায় সবে মাত্র হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মিশনারিরা উদ্যোগ নিলেন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের, তারা স্কুলও করলেন কিন্তু কোনও বড় ঘরের মেয়েরা এখানে পড়তে এলেন না। নিম্নবর্ণের বা খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরা পড়তে এলেন, তবে তা যতটা লেখাপড়া শেখার জন্য তার চেয়েও বেশি, স্কুলে খাবার, পোশাক-আশাক পাওয়া যাবে এই লোভে। ফলে স্কুল হল, শিক্ষা হল না।

১৮৪৯-এ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেথুনের উদ্যোগে। স্কুলের জমি দিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং স্কুলের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই স্কুলে পড়তে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী দেবী, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের দুই

Scanned with CamScanner

কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। বিদ্যাসাগর ও বেথুন বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসতেন স্কুলে পড়াবার জন্য। ১৮৪৭ এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্র ও প্যারীচরণ সরকার এবং নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বারাসত মহকুমায় দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত এই দুটিই আমাদের এখানে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। তবে স্কুল তো হল ছাত্রী কোথায়?

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ানো হত বাংলাভাষায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা মেয়েদের পড়াশুনোর জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে বাইবেল পড়ানো হত। অনেকেরই ভয় হল যে এই স্কুলগুলি মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার একটা জায়গা। তাছাড়া এখানে সমাজের তলার দিকের মেয়েরাই পড়তে আসে বেশি। তাদের সঙ্গে তো ভদ্রঘরের মেয়েদের পড়তে পাঠানো যাবে না। অথচ মেয়েদের লেখাপড়া শেখা দরকার এটা তখন সমাজের অনেকেই ভাবছেন। বারাসতের স্কুল এবং হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় এরই ফল।

বিদ্যাসাগর মেয়েদের অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এলেন। তিনি বুঝলেন কোনও সমাজ সংস্কারই কার্যকর হবে না, যদি না দেশের মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়! বেথুন স্কুল বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ভদ্রঘরের মেয়েদের এখানে যাতে পড়তে পাঠানো হয় সম্ভবত সেই জন্যই এই স্কুলের (১৮৫৬)-র Prospectus-এ লেখা ছিল "শুধু মাত্র ভদ্রঘরের মেয়েরাই এখানে শিক্ষালাভের অধিকারী।"

সমস্যা দেখা দিল কারা পড়াবেন তাই নিয়ে। পুরুষের কাছে মেয়েরা পড়বেন? বিদেশ থেকে ইংরেজ মহিলারা পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে এলেন। কিন্তু বাংলা পড়াবেন কারা? তাছাড়া মেয়েরা কি ইংরেজি ভালো করে শিখতে পারবেন?— নানান প্রশ্ন। ছেলেদের তো এ সমস্যা নেই। তাছাড়া ছেলেরা ইংরেজিই শিখতে চান, কারণ ততদিনে সরকারি নির্দেশনামা বেরিয়েছে যে কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষা যারা করবেন তারাই সরকারি চাকুরি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের বাংলা পড়াবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হল।

আরেক সমস্যা বাল্যবিবাহ। ১০ বছর বয়স হতে না হতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাছাড়া লেখাপড়ার মানও বেশ নিম্ন।

Scanned with CamScanner

ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। আর এই পরিবর্তনে ব্রাহ্ম আন্দোলন একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবও এ ক্ষেত্রে কম নয়। শহরের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মনেও স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে আগ্রহ দেখা দিল। মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে এখানে কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না, কিন্তু অন্তঃপুরিকাকে শিক্ষা দিলে অন্তঃপুর সুন্দর হবে শ্রী মণ্ডিত হবে। মনুসংহিতায় আছে "কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ "....স্ত্রীলোকের বিদ্যালাভ উচিত বলে মনে হয়েছে, কেবল স্ত্রী সাধারণের কথা ভেবেই নয়, পারিবারিক জীবনে শান্তি, সুখ সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার সাফল্যের কথা ভেবেও।[১৬] পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের চিন্তা যুগের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী বলেই মনে হয়, যখন তিনি 'সর্ব শুভঙ্করী' পত্রিকায় লিখছেন " বিদ্যাশিক্ষা করে মেয়েরা অর্থ উপার্জন করতে পারবে এবং পারিবারিক জীবনে পুরুষের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে পারবে।" মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার কথা সে যুগে এভাবে কেউ লিখেছেন বলে জানি না।

ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হল। একই সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যও কায়েম হল। আধিপত্য কায়েম করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়—কলকাতা, মাদ্রাজ (চেন্নাই) এবং বোম্বাইয়ে (মুম্বাইয়ে) ১৮৫৭ সালে। বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০-র মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, শুধু শহর কলকাতায় নয়, মফঃস্বলেও। শিক্ষা নারীকে সচেতন করে সাহসী করে। এতদিন যে কথা বলার সাহস পায়নি এইবারে মেয়েরা সাহস করে অনেক কিছু বলতে চাইল। মধুমতী গাঙ্গুলী বামাবোধিনী পত্রিকায় "বামাগণের রচনা" প্রবন্ধে লেখেন "বাঙ্গালী ভগিনীগণ! একই ঈশ্বর আমাদের এবং পুরুষ মানুষকে তৈরি করেছেন। একই অনুভূতি, একই রকম মানসিক চিন্তাধারা দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন নারী ও পুরুষকে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই চাননি যে পুরষরাই শুধু শিক্ষালাভের আনন্দ উপভোগ করবেন আর স্ত্রীলোকরা অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবেন। কেন আমরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো?"[১৭] তবে অনেক শিক্ষিত লোকই মনে করতেন লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের যে সহজাত নম্রতা, বিনয় ইত্যাদি গুণ আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষা মেয়েদের অহংকারী করে তুলবে, তারা কাউকে মানতে চাইবে না, এতে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম ভাবনা শুধু পুরুষের নয়, বেশ কিছু স্ত্রীলোকেরও ছিল। 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক এবং

Scanned with CamScanner

কবি ঈশ্বর গুপ্ত বেথুন স্কুলের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার তিনি বিরোধী হয়ে উঠলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। ১৮৫০-এ মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে বিদ্রূপ করে তিনি কবিতা লিখলেন। অথচ এই সময় মেয়েদের স্কুল হয়েছে ঠিকই কিন্তু লেখাপড়ার কোনও অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা কী হতে পারেন এই ভেবেই সমাজের কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন। আবার বেথুন স্কুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই জয়কৃষ্ণ মুখার্জী (উত্তরপাড়ার জমিদার) উত্তরপাড়ায় এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র রাজশাহীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মেয়েরা পড়বে, কিন্তু বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করবে, সমাজের অনেকেই এটা মেনে নিতে পারলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধুরা মিলে যখন মহিলাদের জন্য মহিলপুরে স্কুল তৈরি করলেন তখন প্রচণ্ড বাধা পেলেন ওখানকার জমিদার, এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছ থেকে। স্কুলে কেউ মেয়ে পাঠালেন না, তারপর একদিন রাতে স্কুল বাড়িটা কে বা কারা যেন পুড়িয়ে দিলেন। মেয়েরা তখন লেখাপড়া শিখতে পারলেন, যাদের বাড়িতে, বাবা বা স্বামী তাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। যারা স্ত্রী শিক্ষার প্রবল সমর্থক ছিলেন, যারা সঠিকভাবেই মনে করতেন শিক্ষিত পুরুষের স্ত্রী যদি শিক্ষিত না হন তবে তিনি যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারবেন না, আশ্চর্য তাদের স্ত্রী এমনকী মেয়েরাও সবাই স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করেননি, বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছেন। রাসসুন্দরী দেবী, বামাসুন্দরী দেবীর মতো কেউ কেউ নিজেরা নিজেদের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্রবময়ী, কৈলাসবাসিনী দেবী, অন্নদায়িনী লাহিড়ি, কুমুদিনী, মনোরমা মজুমদার, নিস্তারিণী দেবী প্রত্যেকেই বাড়িতে লেখাপড়া করেছেন। তারপর প্রত্যেকেই কিন্তু সমাজে এবং শিক্ষাজগতে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মুসলমান মেয়েরা তখন আরও কম প্রকাশ্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। বেগম রোকেয়া এবং তাহেরুন্নিসার মতো সুশিক্ষিত সুলেখিকার সন্ধান আমরা পেয়েছি উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই।

স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে অনেকেই সাহস করে এগিয়ে এলেন। সংবাদ পত্রে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হল— অবলাবান্ধব, মাসিক পত্রিকা এবং বামাবোধিনী পত্রিকাতে। আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মুক্তবুদ্ধির পুরুষেরা।

Scanned with CamScanner

লেখাপড়া জানা ছেলেরা স্বাভাবিক ভাবেই লেখাপড়া জানা মেয়েদের বিয়ে করতে চাইলেন। ছেলেদের যদি শিক্ষা দিতে পারা যায় তবে একইভাবে মেয়েদেরও কেন শিক্ষিত করা যাবে না? —এ প্রশ্নও উঠল। রক্ষণশীল পরিবারগুলোও এবারে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দানের জন্য মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে বাধ্য হলেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে নিজেরাই আগ্রহী, কিন্তু তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হল যোগ্য স্ত্রী হবার জন্য, তাদের নিজস্ব প্রয়োজন বা আগ্রহের জন্য নয়।

১৮৭০-৮০-র মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটল। ১৯০১-এর সেন্সাসে দেখা গেল শুধু স্কুলের সংখ্যা এবং ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে তাই নয়। আগে যেখানে ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরাই শুধু স্কুলে পড়তে এসেছেন সেখানে অন্যান্য হিন্দু পরিবার থেকেও মেয়েরা পড়তে আসছেন। ১৮৯০-৯১-১৯০১-এর রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১৮৬৩ তে স্কুলের সংখ্যা ৯৫টি, ছাত্রী সংখ্যা ২,৪৮৬ জন। সেখানে ১৮৯০-এ স্কুলের সংখ্যা ২,২৩৮ টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭৮,৮৬৫ জন। উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্ম পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার হার ৫৫.৬ শতাংশ, ইংরেজি জানেন ৩০.৯ শতাংশ, বৈদ্যদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার ২৫.৯ শতাংশ, ইংরেজি জানেন শতাংশ .৮ শতাংশ, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে আরও কম কিন্তু ৫ থেকে ৮ শতাংশ মেয়ে পড়াশুনা করছেন। এ পরিবর্তনটা সত্যিই লক্ষণীয়।[১৮]

তবে মেয়েদের জন্য পাঠক্রম কী হবে এ নিয়ে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দিল। অনেকেই কেশব সেনও মনে করতেন মেয়েদের বিজ্ঞান, গণিত বা ইতিহাস, ভূগোল পড়ার দরকার নেই। তাদের কিছুটা সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, সেলাই, গৃহবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য এসবই পড়ানো উচিত। কারণ যতই লেখাপড়া শিখুন মেয়েদের স্থান তো ঘরের মধ্যেই, তাদের তো বাইরে কোনও কাজ নেই। দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো 'র‍্যাডিকাল' ব্রাহ্মরা এতে আপত্তি জানালেন। তাদের মত হল মেয়েদের যদি ছেলেদের মতো উচ্চশিক্ষিত করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে তাদের পাঠক্রমে তফাত থাকবে কেন? শিবনাথ শাস্ত্রী সমস্ত বিষয়েই মেয়েদের শিক্ষাদান করতেন।[১৯]

অবশ্য অধিকাংশ মেয়েরাও মনে করতেন তাদের এবং ছেলেদের পড়ার বিষয় এক হবার প্রয়োজন নেই। ছেলেদের কাজ বাইরের জগতে আর মেয়েদের জগৎ হচ্ছে তার গৃহ। সুতরাং মেয়েরা যাতে গৃহকর্মনিপুণ হতে পারেন, স্বামী সন্তান ও আত্মীয় পরিজনের যত্ন করতে পারেন, সন্তানকে

যোগ্যভাবে প্রতিপালন করতে পারেন — সেই শিক্ষাই মেয়েদের প্রয়োজন।

'বঙ্গমহিলা' স্ত্রীলোক সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা, সম্পাদিকা মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। তাতে লেখা হল "স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাহাদের যে স্বাধীনতা আছে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। বঙ্গ মহিলাদের অনেক অভাব আছে। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, অধুনা সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাহাদের বর্তমান পোষাক পরিবর্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথারও নাই।"[২০] স্ত্রী শিক্ষার, স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থক অনেক মহিলাই যেভাবে স্ত্রী শিক্ষা বা স্ত্রী স্বাধীনতা আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে মনে হয় তাতে অখুশি এমনকী আতঙ্কিতও। ১৮৭৮-এর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা হল আমরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী নই। নিশ্চয়ই মেয়েরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হবেন এবং শিক্ষার আলোকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবেন। আমরা আশা করব শিক্ষা তাদের চরিত্রে এমন কতগুলো গুণের সঞ্চার করবে যা তাদের বাংলার শিক্ষিত মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্রী করে তুলবে। ...আমরা মনে করি মেয়েদের এমন সব বিষয় পড়া উচিত যা তাদের যোগ্য স্ত্রী এবং যোগ্য মাতা হতে সাহায্য করবে। যে শিক্ষা চলছে তা মেয়েদের বিলাসী এবং সংসার সম্বন্ধে এমনকী তাদের সন্তান পালনেও উদাসীন করে তুলেছে। এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয়।[২১]

অনেকেই মেয়েদের স্বাধীনতা ও শিক্ষাকে ভালো চোখে দেখেননি। এটা অস্বাভাবিক নয়। স্বাধীনতাকে তারা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর বলেই মনে করেছেন এবং ধরেই নিয়েছেন যে আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষার ফলে তাদের মেয়েলি চরিত্রই হারিয়ে ফেলছে, এবং এটা মূলত ইংল্যান্ডের স্বেচ্ছাচারী মেয়েদের প্রভাবে। জানা উচিত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও ইংলান্ডে মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের আপত্তি ছিল প্রবল। লন্ডনে ১৮৬৩-তে একটি মেয়েদের কমিটি তৈরি হয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে। অনেকেই লেখাপড়া শিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অনুমতি চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এবং পার্লামেন্টে কয়েকশো মেয়ে স্বাক্ষর করে তাদের আবেদন জানালে বেশ কয়েকজন পুরুষ তাদের এই অনুমতির জন্য সুপারিশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার অনুমতি দেন। ১৮৭৮ পর্যন্ত ইংরেজ মহিলারা এই পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাননি। অক্সফোর্ড ১৯২০-

Scanned with CamScanner

তে এবং কেমব্রিজ ১৯২৩-এ মেয়েদের এই অধিকার দেয়। পুরুষদের বোধ হয় আর একটা ভয় ছিল যে মেয়েরা শিক্ষিত হলে তাদের বেকারি বাড়বে।

কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসুও ঠিক এই রকম লড়াই করে শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পান এবং ১৮৮৩-এ বি. এ. পাশ করে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটের সম্মান অর্জন করেন। তারপর কাদম্বিনী ডাক্তারি পাশ করেন, সেও আর এক লড়াই, এবং লেডি ডাফরিন কলেজ ও হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন। চন্দ্রমুখী এম. এ. পাশ করে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। দুর্গামোহন দাসের মেয়ে অবলা বসু মাত্র ১৭ বছর বয়সে ডাক্তারি পড়তে যান মাদ্রাজে। তখন বেথুন স্কুল এবং কলেজ ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং লরেটো কলেজ এই তিনটিই ছিল মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান। প্রথম দুটি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রীই ব্রাহ্ম পরিবারের।

Scanned with CamScanner